‘কচুরীপানা’

খন্দকার মোঃ আবদুল গণি

কার্তিকের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ করেই হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ হতে প্রবাহিত জলধারা পদ্মানদীর দু’ কুল ছাপিয়ে উপচে পড়ে পার্শ্ববতী গ্রামে প্রবেশ করার ফলে দেখা দিয়েছে অকাল বন্যা। চারিদিকের মাঠ-ঘাট জলে একাকার। শুধু কি মাঠ-ঘাট? অপেক্ষাকৃত নিম্ন অঞ্চলে বসবাসরত গ্রাম্য জনসাধারণের বসতভিটার চিহ্ন মাত্র নেই। শুধু পানি আর পানি যেন অথৈ সমুদ্র। ভিটে ডোবা মানুষগুলো আশ্রয় নিয়েছে অপেক্ষাকৃত নিচু অঞ্চল নিতাই নগর গ্রামে। নিতাই নগর গ্রামে যে বন্যা হানা দেয়নি এমনটা নয়। দু’ চার বাড়ীতে কোমর পানি। পাশ্ববর্তী গ্রামের সাথে যোগাযোগের জন্য যে রাস্তা আছে তা প্রবল বন্যার দাপটে ভেঙ্গে গিয়ে হু হু করে বন্যার পানি প্রবেশ করছে, আশে-পাশের ক্ষেতখামারে।

দিন মজুর আবুল মিয়ার চোখে ঘুম নেই। বাড়ীর পালানে যে কাঠাখানেক জমিতে মরিচের চাষ করেছিল তা ডুবে গেছে। মরিচ গাছের শাখা-প্রশাখা বন্যার জলে পঁচে এলকোহলের মত নেশাময় গন্ধ সৃষ্টি করেছে আর তা নাকের মধ্যে প্রবেশ করলে একপ্রকার নেশা হয়। মাঠের পশ্চিমপ্রান্তে একেবারে নালা সংলগ্ন দু’ বিঘা জমি লিজ নিয়ে আমন ধানের চাষ করেছে। সে জমির ধান এখনও ডোবেনি ডুবল বুঝি। ধান গাছের বাড়ন্ত শিশুরা প্রচন্ড খড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যৌবনের মধ্য বয়সে পৌছে গেছে পরিপক্ক হবার আশা বুকে নিয়ে এমনি সময়ে আবার ও বন্যার সঙ্গে পাল্লা দিতে হচ্ছে। তারাই বা কত সইবে? কিছু করার যেহেতু নেই সেহেতু টুটি পর্যন্ত শত্রু আচ্ছাদিত হয়েও বাঁচার আশায় বদ্ধ জীবন নিয়ে কোনরকমে টিকে আছে। বন্যার পানি না হয় মেনে নেওয়া গেল কিন্তু কোথা থেকে ভেসে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে কচুরীপানা আর সে কচুরীপানা ধানক্ষেতের আইলে দন্ডায়মান ধইঞ্চা গাছের বেষ্টনী ভেদ করে প্রবেশ করছে ধানক্ষেতের মাঝে।

ঘুমহীন চোখে আবুল মিয়া ভবিষ্যতের চিন্তায় অধীর। এ দু’ বিঘা জমির ধান নষ্ট হয়ে গেলে সে খাবে কি? কি করে চলবে পরিবার? নিজের একার আয় দিয়ে তিন সদস্যের ভরণপোষণ ঠিকমত চলে না বলে স্ত্রী জমিলা বেগম সংসারের কাজে বেশ সাহায্য করে। বাড়ীর আনাচে-কানাচে বিভিন্ন মৌসুমী সবজীর চাষ করে বেশ ভালোই আয় করে। তাই সে স্ত্রীর প্রতি বেশ কানিকটা কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতের কল্পনায় হঠাৎ ছেদ পড়ল অতীতের কথা স্মরণ হয়ে। মেম্বারের কাছ থেকে তিনমণ ধান

দেবার শর্তে পাঁচশত টাকা ধার নিয়েছে। এখন যদি ধান নষ্ট হয়ে যায় তবে তিনমণ ধান পরিশোধ করবে কিভাবে? ধান দিতে না পারলে পাঁচশত টাকা ফেরত নেবে এমনটা নয় ঠিক তিনমণ ধানের টাকা পরিশোধ করতে হবে। মেম্বার একপয়সাও ছাড়বেনা, কড়ায় গন্ডায় আদায় করে নেবে। তার ওপর কথা বলার সাহস আবুল মিয়ার কেন সারা অঞ্চলের কারও নেই। বলতে গেলে মেম্বারই এ অঞ্চলের মা-বাপ। তার কথায় শত-সহস্র মানুষ উঠে-বসে। এমনকি কল্পনায় নিদ্রাহীন চোখ নিয়ে আবুল মিয়া পাশ ফিরে শু'ল। স্ত্রী জমিলা বেগম তখনও ঘুমায়নি। দু' জনে একই চিন্তায় অধীর। ঘরের মধ্যে নিকষ কালো অন্ধকার থাকায় দু' জনেই যে জেগে আছে তা দু' জনারই অজানা। হঠাৎ জমিলা বেগম পাশ ফিরে শুয়ে এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠল 'আল্লাহ'। এমন অসময়ে স্ত্রীর এমন দীর্ঘ নিঃশ্বাস শুনে আবুল মিয়ার চিন্তার কুয়াশা একেবারে কেটে গেল। পাশ না ফিরে সে স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল–

– এহন ও ঘুমাও নাই?

– ঘুম যে আহে না!

আবার ও দু' জনেই নিরব।ঘরের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। মাঝে-মাঝে তাদের একমাত্র ছেলে তোতা মিয়া নাক ডাকিয়ে নিরবতা ভেঙে দেয়। বাইরে ঝিঁ ঝিঁ পোকা আর গুবরে পোকার একটানা আর্তনাদ। মাঝে-মাঝে ব্যাঙের আর্ত চীৎকার ভেসে আসে। বিষাক্ত সাপের পাকস্থলীতে পড়ার পূর্বে নিজেকে আত্মরক্ষার জন্য শেষ চীৎকার। শেয়াল গুলো মাঠ ডোবার কারণে লোকালয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এত বিপদের মাঝে ও প্রহরে ডেকে উঠার কথা একদম ভোলেনি। মাঝে-মাঝে থেকে-থেকে ডেকে উঠে হু...য়া ...হু...য়া । পিপিলীকা শ্রেনীর পতংগগুলোর আবাসস্থল ডুবে যাবার কারণে আশ্রয় নিয়েছে অপরের ঘরে। খাদ্যের জন্যই হোক আর যে কারণেই হোক সারারাত চলাচল করে। স্বার্থপর মানুষগুলোর গায়ে পড়লে আর রক্ষা নেই। ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবার শাস্তিস্বরূপ টিপে মেরে ফেলে। এবারও কোথা থেকে একটা পিপঁড়া এসে জমিলা বেগমের গায়ে কামড় দিয়ে নিজের জীবন দান করে স্বামী-স্ত্রীর মদ্যে বিদ্যমান নিরবতা ভেঙে দিল আর জমিলা বেগম স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল– আমি বুঝবার পারি তোতার বাপ তোমার মনের কথা সারাডা রাইত এমনি কইর‍্যা জাইগ্যা থাহ্‌লে বাঁচ বা নি?

– কি করুম কও? চিন্তায় যে ঘুম আহেনা।

– যা হওনের হইব। আল্লায় আমাগো মাইর‍্যা ফেলাইব না।

– মেম্বারের ট্যাকা ক্যামনে দিমু ?

– তুমি দিবার না পারলে আমি দিমু।

– ক্যামনে দিবা?

– য্যাম্‌নে পারি ত্যাম্‌নে দিমু ।

স্ত্রীর কথায় কিছুটা শান্ত না পেল আবুল মিয়া। তার শ্বশুর বাড়ী পূব দেশে। সেখানে কোন বন্যা হয়নি। বরেন্দ্র অঞ্চলে এত সহজে বন্যার পানি উঠেনা। সরকারী উদ্যোগে সেখানে ডিপ কল স্থাপন করার ফলে সেচের সুবিধা হয়েছে। এই সুবিধার কারণে প্রতিটি মৌসুমে বাম্পার ফলন হয়। তার শ্বশুরেরা অবশ্য তার মত দিনমজুর নয়। বেশ জমি-জমা আছে এবং বলা চলে সচ্ছল গৃহস্থ। প্রয়োজনের সময় শ্বশুরেরা তাকে বেশ সাহায্য করে থাকে। আবুল মিয়ার কাছে শান্তনা ও ঐ একটাই। তাই সে স্ত্রীর শান্তনার বাণীতে চুপ করে রইল। ইতিমধ্যে ভোরের দোয়েল পাখীরা ডেকে উঠে আবুল মিয়াকে জানিয়ে দিল যে রাত ফর্সা হয়েছে। কৈ মাছ ধরার জন্য রাত্রে জাল সড়কের ওপরে পেতে রেখে এসেছে। দেরী হয়ে গেলে দুষ্ট ছেলের দল সব মাছ নিয়ে যাবে এমনকি জাল নিতেও ছাড়বেনা তাই সে দ্রুত উঠে ঘর থেকে বের হয়ে জাল তুলতে চলে গেল।

জাল তুলে ফিরে এসে আবুল মিয়া মহা খুশী। তার জালে বেশ কয়েকটি কৈ মাছ এবং আফ্রিকান মাগুর ধরা পড়েছে। মাছের ঝুড়ি স্ত্রীকে দিয়ে কোঁটায় জাল বিছিয়ে দিয়ে ছেলে তোতা মিয়াকে উচ্চস্বরে আনন্দ চিত্তে ডাকল। তোতা মিয়ার ঘুম তখনও ভাঙেনি। বন্যার কারণে এখন স্কুল বন্ধ তাই একটু দেরীতেই ঘুম থেকে উঠে। এমন সাত সকালে বাবার ডাকা-ডাকিতে ঘুম ভেঙে গেলে কিছুটা বিরক্তি ভাব প্রকাশ করে ক্ষোভের সঙ্গে তার বাবা আবুল মিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল–

–এই বিয়ান বেলায় ডাক তাছ ক্যা?

– খ্যাতে পানা ডুকছে– বাজান! ফেলন লাগব। না ফ্যাল্‌লে সব ধান গাছ খাইয়্যা ফ্যালাইব?

আবুল মিয়া ছেলেকে যখন আদর করে ডাকে তখন বাজান বলেই ডাকে। ছেলেটিও তার বাবার একান্ত অনুগত। এই একটি মাত্র ছেলে ছাড়া পিতৃকুলে তার আর কেউ নেই। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে জীবনের মধ্যাহ্ন সময়ে সৃষ্টিকর্তা তাকে দান করেছে। ছেলেটিকে নিয়ে আবুল মিয়ার অনেক স্বপ্ন। একদিন সে মানুষ হবে। ছেলেটিও তাকে নিরাশ করেনি। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেনীতে অধ্যয়নরত এবং প্রথম থেকেই শ্রেনীতে তার প্রথম হওয়া চাই...ই....চাই। প্রাথমিক পর্যায়ে নিজের দারিদ্রতার কারনে ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করাতে চায়নি। ভেবে ছিল মজুরের ছেলের আবার পড়ালেখা কি? বড়জোর প্রাইমারী পাশ করবে তারপর আবার ফিরে আসবে বাবার কর্মস্থলে। তার চেয়ে এখন থেকেই কাজে লাগানো ভাল। ছেলের উৎসাহ আর মাষ্টারদের সহযোগিতার আশ্বাসে শেষ অবাধি আবুল মিয়া ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছিল। সেই থেকে তোতা মিয়া স্কুলে যায় এবং সংসারের টুকি-টাকি কাজে বাবাকে সাহায্য করে। আজও তার ব্যাতিক্রম ঘটলো না। বাবার আবেদনে সাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে আসলো।

পিতা পুত্র দু' জনে মিলে বাড়ীর পালান থেকে বিচী কলার গাছ কেটে ভুঁর (ভেলা) বানিয়ে ফেলল। ভুঁর বানাতে-বানাতে বেলা প্রায় নয়টা-দশটা বেজে গেল। ইতিমধ্যে জমিলা বেগম স্বামী-সন্তানের জন্য সকাল বেলার খাবার তৈরি করে ফেলেছে। পিতা-পুত্র দু' জনে ভেজা কাপড় পরেই খাবার খেয়ে মাঠের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। মাঠে প্রবেশ করে আবুল মিয়া দেখতে পেল ঝাঁকে ঝাঁকে কচুরীপানা ধইঞ্চা গাছের বেষ্টনী ভেদ করে ধান ক্ষেতে প্রবেশ করেছে। ধানগাছ এখন সাদা শীষ দেখা দিয়েছে। এমনি অবস্থায় কচুরীপানা সরাতে না পারলে সমস্ত মাঠের ধান গাছ খেয়ে একেবারে সাবাড় করে দেবে। লুঙ্গি কাছা মেরে মাজায় গামছা এঁটে হাতে লগি নিয়ে কচুরীপানা সরানোর জন্য প্রস্তুত হল। ভেলার সম্মুখপ্রান্তে বসে তোতা মিয়া তার বাবা আবুল মিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল– তুমি যে কইলা বাজান, পানায় ধানগাছ যে খাইয়া ফ্যালায়! ক্যামনে খায়?

– দ্যাখ্‌তাছস না, ক্যামনে খাইয়্যা ফ্যালাইছে।

প্রায় কাটা খানেক জমির উপর কচুরীপানার দল আবাস গেড়েছে। তোতা মিয়া দেখল যে – যে স্থান হতে কচুরীপানা সরানো হচ্ছে তার নীচে একটা ধান গাছ ও জীবিত নেই। ওপরে কচুরীপানার দল আর নীচে জটিল জোঁক এই দুয়ে মিলে জীবন্ত ধানগাছ গুলিকে মেরে পঁচিয়ে ফেলেছে। পানির ওপর ভাসছে তাদের মৃত দেহ। হাত দিয়ে সেগুলিকে টেনে তুললে পঁচা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। তোতা মিয়া বুঝতে

পারল কিভাবে কচুরীপানা ধানগাছ গুলিকে খেয়ে ফেলে। ইতিপূর্বে সে ভেবেছিল শুধুমাত্র দাঁত বিশিষ্ট প্রানীই খাবার খায়। প্রকৃতিরাজে নিত্যই কত কি যে ঘটে তা সে বুঝবে কি করে?

পিতা-পুত্র দু' জনেমিলে দ্বি-প্রহরকাল পর্যন্ত পরিশ্রম করে ক্ষেতের সমস্ত কচুরীপানা একে একে সরিয়ে যে পাশ দিয়ে কচুরীপানা ডোকার সম্ভাবনা আছে,সে পাশে বাঁশের খঁটি পুঁতে শক্তকরে বেঁধে একপ্রকার বেষ্টনী তৈরি করে বাড়ীতে ফিরে এল।

ব্যাধি গ্রস্ত মানুষ দীর্ঘ রোগ ভোগ করার পর জীর্ন-শীর্ন দেহ নিয়ে যেভাবে বেঁচে উঠে বিশ্ব সংসারে তার জ্যোতি ছড়ায় ঠিক্ তেমনিভাবে দীর্ঘ মাস দুয়েক বন্যার সাথে সংগ্রাম করে ধানগাছ গুলি এখন পরিপক্ক হয়ে উঠেছে। একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কবে নাগাদ ধান কাটা যাবে তা পর্যবেক্ষন করার জন্য আবুল মিয়া ঘর থেকে বের হতেই ছেলে তোতা মিয়া যাবার জন্য বায়না ধরল। ফিরতে দেরী হতে পারে আর তা হলে স্কুল কামাই হবে এ অজুহাতে ও তাকে নিরস্থ করা গেল না। অগত্যা নিতেই হল। ছেলেকে সংগে নিয়ে আবুল মিয়া মাঠের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

মাঠে পৌঁছে আবুল মিয়ার চক্ষু চড়কগাছ। তার জমিতে লাল ফালনা টাঙানো। নিজে কোনদিন ক অক্ষর ও পড়তে শেখেনি। হিজিবিজি লেখা দেখে ছেলে তোতা মিয়াকে পড়তে বলল। তোতা মিয়া পড়ে দেখল যে তাতে লেখা আছে 'এই জমির ধান সর্ব্বহারাদের অন্য কেউ এ ধান কাটতে পারবে না।

তোতা মিয়ার মুখ হতে সাইনবোর্ডের বাক্যটি নিঃসৃত হবার পর আবুল মিয়া শূন্যে তাকাল। হেমন্তের রোদ্রোজ্জল পরিষ্কার আকাশ থেকে নিঃসৃত সূর্যরশ্মির ঝিকিমিকি আলোয় দেখা গেল তার চোখে-মুখে শংকার ছাপ। বুকের মাঝে জ্বলন্ত আশার দীপ্ত শিখা এক নিমেষে ধপ করে নিভে গেল। যাদের দৃষ্টি ধান ক্ষেতটির ওপর পড়েছে তাদের দৃষ্টি বড়ই তীক্ষ্ণ। এ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আগোচরে কিছুই করা সম্ভব নয়। ছোট্ট কিশোর এ সবের কিছুই জানে না। পিতার চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখে তার কৈশোর মনে নানাবিধ প্রশ্ন দেখা দিতে লাগল। পিতার মুখের এমন আকৃতি সে কোনদিন দেখেনি। তার কিশোর মনে লুকায়িত প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাবার জন্য মনটা ছটফট করতে লাগল। তাই সে পিতাকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্নবান নিক্ষেপ করল।

– বাজান যারা ফাল্না দিছে হ্যারা কারা?

– হ্যারা ডাকাইত। মাইনষের ঘরের ট্যাকা-খ্যাতের ফসল কাইড়্যা নিয়া যায়। কেউ কিছু কইলে রাম দা দিয়া জবাই কইর‍্যা দ্যায়। হেই ডরে কেউ কুন কথা কয় না।

– আমি কমু বাজান। আমাগো খ্যাতের ধান লইয়্যা যাইতে দিমু না। গুলতি দিয়া মাইর‍্যা ফ্যালামু।
– যা কইছস্ আর কইস্না বাজান। হুনতে পাইলে মাইর‍্যা ফ্যালাইব।
– না খাইয়্যা বাঁচনের চাইতে মইরা যাওন বহুত ভালো। প্যাডে খিদা লাগলে বাঁচতে মনে কয়না বাজান।

আবুল মিয়া ছেলের মুখের দিকে তাকায়। একটু আগে যে মুখে বিদ্রোহের দাবানল দেখেছিল ক্ষুধার জ্বালার কথা মনে পড়তেইসে মুখে বিষাদে পাংশূ বর্ণ ধারণ করেছে। বিদ্রোহ আর অসহায়ত্বের মাঝামাঝি পর্যায়ের মুখাকৃতি দেখে আবুল মিয়ার শূন্য উত্তপ্ত মনের মরুভূমির বালিঝড়ের মত উত্তপ্ত ঝড় বয়ে যেতে লাগল। চোখের কোণে দু' ফোটা জল জমে হেমন্তের রোদ্রোজ্জল আলোয় চোখের কোণে মুক্তার মত জ্বল জ্বল করে জ্বলতে লাগল। পাছে ছেলে পুনরায় প্রশ্ন করে আবারও দুখের সাগরে ভাসিয়ে দেয় সেই ভয়ে যত দ্রুত সম্ভব অশ্রু গোপন করে বাড়ীর পথে হাঁটতে লাগল। কিছুদূর এসে ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল–
– তুই ঘরে যা বাজান, আমি মেম্বারের ঐহানে যামু।
– আমিও যামু।
– না ত্বর যাইতে হইব না।
অগত্যা তোতা মিয়াকে হার মানতে হলো। তাই সে ধীরে ধীরে নিরস মনে বাড়ীর দিকে হাঁটতে লাগল আর আবুল মিয়া মেম্বারের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল।
মেম্বার সবেমাত্র গোসল সেরে নাস্তা পর্ব সমাপ্ত করে কাউন্সিলে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এমনি সময়ে আবুল মিয়া একেবারে পায়ের ওপর পড়ে রোদনের স্বরে বলল –
– আমারে বাঁচান হুজুর।
– কেন, কি হইছে ত্বর?
– সর্বহারারা আমার খ্যাতের ধান কাইট্টা নিয়া যাইব।
– ধান কাটলে আমি ঠ্যাকামু ক্যামনে?
– না ঠ্যাকাইলে আমরা খামু কি? বাঁচুম ক্যামনে? আপনের ট্যাকা ক্যামনে দিমু?
– বাঁচবি ক্যামনে আমি ক্যামনে কমু? আমার ট্যাকা য্যামনে পারবি ত্যামনে দিবি। আমি এক পয়সা ও ছাড়ুম না।
আবুল মিয়া যেন আকাশ হতে পড়ল। বজ্রাহতের ন্যায় ক্ষনকাল মেম্বারের গন্তব্যের পানে চেয়ে রইল। তারপর অনন্যোপায় হয়ে বাড়ীর পথে হাঁটতে লাগল। পথিমধ্যে সে দেখল আক্কাছ আলী,শওকত আলী, নাসির মিয়া এবং আরও কয়েকজন চাষী

উত্তেজিত ভাবে মেম্বারের বাড়ীর দিকে হেঁটে আসছে। আবুল মিয়াকে সামনে দেখে নাসির মিয়া বলে উঠল–

– কই গেছিলা মিয়া?

– গেছিলাম মেম্বার বাড়ীতে।

– তোমার খ্যাতে ও ফাল্না দিছে!

– হ ভাই। পানা সরাইয়া ভুলই করছি। পানায় খ্যাতের ধান খাইয়্যা ফ্যালাইলে মনডারে বুঝ দিবার পারতাম আল্লাহ্‌র মাল আল্লাহ্‌য় নিছে।

– আরে মিয়া পানা আইবই। তাই বইল্যা গতরে শক্তি থাকতে পানারে ধান খ্যাতে খাইতে দিমু। এহনে চলো.....।

– কই যামু.....।

– কই যামু মানে? কাউন্সিলে যামু। সর্বহারাদের হাত হইতে আমাগো বাঁচাইব না আবার ট্যাকাও মাপ করবনা। আমরা তারে নেতা বানাইছি ক্যান?

আবুল মিয়া দেখল ক্ষুদ্র ও নিরক্ষর চাষীদের চোখে-মুখে বিদ্রোহের আগুন। বিদ্রোহের এই দাবানলে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সব নিঃশেষ করে দেবে। আবুল মিয়ার চোখের সামনে ভেসে উঠল একঝাড়-একঝাড় করে কিভাবে কচুরীপানা সরিয়ে রক্ষা করেছিল কচি ধান গাছ গুলোকে। তাড়াতাড়ি গা ঝাড়া দিয়ে বলে উঠল– হ চলো। আমাগো এতকষ্টের ফসল কাইড়্যা নিয়া যাইতে দিমু না। যা থাহে কপালে। আগে মেম্বাররে ধরমু তারপর সর্বহারাদের। যেমুন কইর‍্যা পানা সরাইয়া ফ্যালাইছি তেমুন কইর‍্যা ওগোরে সরাইয়া ফ্যালামু.....।

উত্তেজিত ক্ষুদ্র জনতার ঢেউ চোখে-মুখে বিদ্রোহের আগুন নিয়ে কাউন্সিলের দিকে হাঁটতে লাগল–।

খন্দকার মোঃ আবদুল গণি, গ্রামঃ নিতাই নগর, থানা – বড়ইগ্রাম, জেলা – নাটোর